দৈনিক খবর 42
তারিখ 01 SEP 1992
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ...

মেধা যাচাইয়ের উপায় কি?

• জোবেদ আলী •

প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও দার্শনিক রেয়ার বলেছেন, পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো- একজন শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান, নিজ বক্তব্য প্রকাশে স্বকীয়তা এবং মোটামুটি পাঠ্য বইয়ের বাইরের সংশ্লিষ্ট জ্ঞান অর্জনের মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন পদ্ধতি ১৯৪৭ সাল থেকে একটির পর একটি এদেশে পরিবর্তন করা হচ্ছে। সবাই বলেন, এই পদ্ধতি মান্ধাতা আমলের। এই পদ্ধতি বৃটিশ এদেশে চালু করেছিল তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। কাজেই এ নিয়ম অচল। বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত হন। যারা বৃটেন থেকে ডিগ্রী আনেন, তারা বৃটেনের ধাঁচে পরীক্ষা পদ্ধতি প্রণয়নের সুপারিশ করেন। আর যারা আমেরিকায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তারা সেখানকার পদ্ধতি চালু করবার পরামর্শ দেন। আবার যিনি রাশিয়া থেকে ফিরে এলেন, তিনি উপদেশ দেন সেই মোতাবেক। কেউ এদেশের বাস্তবতার নিরিখে পরামর্শ দেন বলে আমাদের মতো নির্বোধেরা ভাবেন না।

কথায় বলে, রাজায় রাজায় লড়াই হয় নলখাগড়ার জীবন যায়। আমাদের সন্তান-সন্ততিদের এভাবেই জীবন যাচ্ছে। যারা ধনীর ভাগ্যবান সন্তান তারা বিদেশে গিয়ে লেখাপড়া করছে। তাদের অসুবিধা নেই। আমাদের দেশে ১৯৭০ পর্যন্ত ছিল এক ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি। ১৯৭০ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত আরেক পদ্ধতি। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯১ পর্যন্ত আবার নতুন নিয়ম। ১৯৯২ সাল থেকে অন্য পদ্ধতি। যখন যিনি শিক্ষামন্ত্রী হন তখন তিনি নতুনত্ব দেখাতে উৎসাহী ও আগ্রহী। সবার এক কথা- পরীক্ষা পদ্ধতি ঢেলে সাজাতে হবে।

১৯৯২ সালে যে পদ্ধতি বোর্ডগুলো চালু করলো, তা হলো টাস্কফোর্স প্রণীত ও উদ্ভাবিত পদ্ধতি। এই পদ্ধতি প্রবর্তনের পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল, যতদূর জানা যায়, তা হলো পরীক্ষায় নকল বন্ধ করা। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা চালু করলে নকল বন্ধ হবে। পরীক্ষামূলকভাবে ৫০ নম্বর নৈর্ব্যক্তিক ও ৫০ নম্বর রচনামূলক রাখা হলো। সেখানে বলা হলো, নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক বিষয়ে আলাদা আলাদা পাস করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে মিছিল করল। গাড়ী ঘোড়া ভাঙলো। শ্লোগান দিল। পৃথক পৃথক পাস করবার শর্ত বাতিল করল। অংকের নৈর্ব্যক্তিক চলবে না ইত্যাদি।

তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্রী সাহেব স্কুল ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি কবুল করে নিলেন। ব্যস, আর বাধা কোথায়? রচনামূলক না পড়লেও চলে। নৈর্ব্যক্তিকে ৫০ পেলেইতো চলে। পেয়েছেও। রচনামূলক পত্রে ডবল জিরো। নৈর্ব্যক্তিকে ৫০। ফলে দ্বিতীয় বিভাগের ছাত্র প্রথম, প্রথম বিভাগের ছাত্র-ছাত্রী স্টার পেয়ে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। স্টারতো বাজারের মাছের ভাগার মতো। আর প্রথম বিভাগ অতি সহজলভ্য ব্যাপার। টাস্কফোর্স ও মন্ত্রী মহোদয় এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, কেউ ফেল করবার জো নেই। এবার যে ফেল করেছে সে একেবারে অস্পৃশ্য বলে গণ্য।

আমাদের দেশে শিক্ষার চারটি পর্যায়- প্রাইমারী, সেকেন্ডারী, হায়ার সেকেন্ডারী ও ইউনিভার্সিটি। প্রাইমারীতে অক্ষরজ্ঞান থেকে পরিবেশ্ পরিচিতি সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা হয়। লিখতে পড়তে শেখানো হয়। মাধ্যমিক পর্যায়ে শেখে নিজের অর্জিত জ্ঞানকে সুন্দর, সুশৃংখল, সাবলীল করে প্রকাশ করতে। ভাষা শেখে। প্রকাশ ভঙ্গী শেখে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভাষা শেখান হয় না। সেখানে বিষয়ের বিস্তৃত জ্ঞানার্জন করতে শেখে।

কিন্তু আমরা মাধ্যমিক পর্যায়ে শেখাচ্ছি টিক দেয়া। বলা হবে, কেন রচনামূলকতো রয়েছে। কিন্তু কথা হলো, যেখানে অনুমানে টিক দিয়ে ৫০-এর মধ্যে ৩০ পাওয়া যায়, সেখানে রচনামূলক উত্তর করতে পড়াশোনা বা পড়া শেখার প্রয়োজন নেই তো। কাজেই ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখা ছেড়ে দিয়ে দুনিয়ার যত কুকর্ম আর অপকর্মে লিপ্ত হচ্ছে। সন্ত্রাস বিস্তারে সক্রিয় সহযোগিতা দান করছে। নকল বন্ধ করতে গিয়ে এখন ফটোস্ট্যাট মেশিনে নকল করে সরবরাহ করা হচ্ছে।

এক সময় ছিল একটি ছাত্র-ছাত্রী বোর্ডে স্ট্যাণ্ড করাতো দূরের কথা, প্রথম বিভাগে পাস করলে সমাজে সে মেধাবী বলে স্বীকৃত হতো। আজ যারা স্টার মার্কস পেয়েছে তারা একটি বাংলা বা ইংরেজি বাক্য শুদ্ধ লিখতে সক্ষম নয়। অভিজ্ঞমহল ভাবছেন এবার যারা স্টার বা প্রথম বিভাগে পাস করেছে, উচ্চ মাধ্যমিকে এরা পাসই করতে পারবে না। কারণ সেখানে টিক দেয়া পরীক্ষা নেই। উচ্চ মাধ্যমিকে গেড়া মেরে সন্ত্রাসে নেমে পড়বে মালকোচা মেরে। কারণ লিখতে পড়তে শেখেনি। দোষ কার? শিক্ষক-শিক্ষিকার? নাকি পরীক্ষা পদ্ধতির? শিক্ষক শ্রেণীতে পড়ান, ছাত্র-ছাত্রী বাড়িতে পড়ে না। অনুমানে টিক দেয়ার আশায় থাকে। কাজেই ভিডিও গেম খেলা, সচ্ছল পরিবারে ভিসিআর ভিসিপির সদ্ব্যবহার করে মারামারি, পিস্তল ছুরি মারার কায়দা কানুন রপ্ত করছে আখেরাতের জন্য। কারণ, আয় রোজগারের জন্য চাকরি নেই। চাকরি আছে, লেখাপড়া নেই। চাকরি মেলে না।

যা হোক, আমরা আমাদের সন্তানদের মধ্যে শিক্ষার যে বৈষম্য সৃষ্টি করছি তা সমাজের কারও জন্য ভালো নয়। ১৯৭০-এর আগের ছাত্র-ছাত্রীরা যা শিখেছে, ১৯৭০-এর পরের ছাত্র-ছাত্রীরা অন্যরকম শিখেছে এবং তা ওদের চেয়ে নিম্নমানের। ১৯৮৪ পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা যা শিখল তার পরের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা তার চেয়ে নিচুমানের। ১৯৯২-এর পর কোন মান আছে বলে মনে হয় না। এই যে বৈষম্য এ বৈষম্য দেশের কোন মঙ্গল বয়েআনবেনা।

তা'হলে কি করা হবে? আমাদের কথা হলো, প্রথমতঃ শিক্ষা ক্ষেত্রে দু'দিন অন্তর নীতি বদলান বন্ধ হোক। পৃথিবীর যেসব দেশে শতকরা একশ' জন শিক্ষিত তারা কি দুইদিন অন্তর শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন করে? না করছে? তা'হলে আমাদের মতো গরিব অনুন্নত দেশে এই বিলাসিতা কেন? কিছুদিন আগে আমাদের কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান মহোদয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট যে রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন তাতে লেখা ছিল, এদেশের বিসিএস পরীক্ষার্থীদের শিক্ষার মান এত নিচে যে, তাদের দেশের গুরুত্বপূর্ণ পদের জন্য মনোনীত করা বিপজ্জনক। এই যদি হয়, তবে সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, যখন অফিস, আদালত চালাতে বিদেশ থেকে লোক ভাড়া করে আনতে হবে।

মরহুম সাহিত্যিক আবুল ফজল সাহেব বলেছিলেন, 'আমাদের আর ডিগ্রীধারী প্রয়োজন নেই। শিক্ষিত লোক প্রয়োজন। অর্থাৎ ছুরি, চাকু, পিস্তল, চোথার বদৌলতে যথেষ্ট ডিগ্রীধারী বেরিয়েছে, কিন্তু লেখাপড়া জানা কেউ নেই। আমাদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলো ধীরে ধীরে শিক্ষকশূন্য হয়ে পড়ছে। কলেজগুলোতেও তাই। বিসিএস পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে আসছে। তাহলে এদেশ চলবে বা চলছে কিভাবে ভেবে দেখুন।

বলছিলাম মাধ্যমিক স্তরে টাস্কফোর্স বাতিল করা হোক। রচনামূলকও নয়, আবার নৈর্ব্যক্তিকও নয়। একটি প্রশ্নের উত্তর যাতে পাঁচ ছয়টি বাক্যে দিতে হয়, এমন সংক্ষিপ্ত উত্তরের প্রশ্ন চালু করা হোক। এতে পরীক্ষার্থীকে বইয়ের প্রতিটি পংক্তি তন্ন তন্ন করে পড়তে হবে। নকল করবার সুযোগ থাকবে না। ভাষা শিখে ও প্রকাশ ক্ষমতা বাড়াতে বাধ্য হবে। ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের স্বকীয়তা ও মেধা প্রমাণ করতে পারবে। ফাঁকিবাজরা ঝরে যাবে। সমাজে শিক্ষিত মানুষ তৈরী হবে।

দ্বিতীয়তঃ বোর্ডের গাইড বই বন্ধ করা হোক। কারণ, গাইডের মতো হাজার হাজার বই বাজারে পাওয়া যায়।

তৃতীয়তঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় বিভাগ স্টার মার্কস এবং মেধা তালিকা বিলোপ করে শুধুমাত্র ক খ গ বা এ বি সি এই ধরনের গ্রেড দেয়া হোক।

এ দেশের পরীক্ষায় দুর্নীতির অন্যতম কারণ, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, ভার্সিটিতে নম্বরের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ। এর ফলে পরীক্ষার্থীরা মরিয়া হয়ে অধিক নম্বর সংগ্রহের জন্য চোথা, নকল, ছুরি, পিস্তল ব্যবহার করে। আবার ধনাঢ্য ব্যক্তি টাকার বস্তা নিয়ে ঘোরেন ছেলেকে বোর্ডে মেধা তালিকায় নাম তোলার জন্য। তদবির করেন প্রধান পরীক্ষক ও সমীক্ষকদের কাছে। আর তারাও দেখেন, সমাজে সবাই যখন টু পাইস জোগাড়ের তালে আছে, তখন তিনিই বা বাদ পড়েন কেন? নগদ যা পাও হাত পেতে নাও। আপনারা বলবেন শিক্ষক হয়ে এই কাজ করবেন কেন? ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না, শিক্ষকও এই সমাজের রক্ত মাংসের মানুষ। তিনি সৎ ও আদর্শ বলে তো সমাজ তাকে স্বীকৃতি দেয় না। তার সন্তান না খেয়ে ছেঁড়া কাপড় পরে ঘুরলে সমাজতো তাদের খাওয়া পড়া দেয় না। কাজেই তিনিও ঐ পথে পা বাড়াতে বাধ্য। ব্যতিক্রম থাকবেই।

চতুর্থতঃ কলেজ ও উচ্চ শিক্ষায় বিভাগ বা নম্বর দ্বারা মেধা যাচাই না করে পরীক্ষা নিয়ে মেধা যাচাই করা হোক। এতে অনেক দ্বিতীয় তৃতীয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরও প্রকৃত মেধার পরিচয় মিলতে পারে। ভর্তি পরীক্ষার ফলকে চূড়ান্ত বলে ধরা হোক। এ ভর্তি পরীক্ষায় সকল ছাত্র-ছাত্রীকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হোক। যাতে তারা তাদের মেধা প্রমাণ করবার সুযোগ পায়।

আমার কলেজ জীবনে একজন শিক্ষক ছিলেন যিনি এম এ-তে তৃতীয় শ্রেণীপ্রাপ্ত। কিন্তু জ্ঞানের গভীরতা তাঁর এত অধিক ছিল যে, যারা প্রথম শ্রেণীপ্রাপ্ত ছিলেন তারাও তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। কাজেই পরীক্ষায় যার যার মেধা প্রমাণ করবার জন্য টিক টাক নয়, লিখতে দেয়া হোক। এতে তার চিন্তা, কল্পনা, স্বকীয়তা ও প্রকাশ ক্ষমতার পরিচয় মিলবে। প্রশ্ন উঠবে, নোট মুখস্ত শিখবে। শিখুক। কারও তৈরীকৃত নোট মুখস্থ করে লেখা যদি দোষের না হয়, তবে বাজারের বা টেক্সট বুক বোর্ডের গাইড মুখস্থ শিখলে দোষ কি? এতে অন্তত কিছু ভাষা, বাক্য, সুন্দর কিছু শব্দতো মুখস্থ করবে। এটা নিশ্চয়ই তাকে কোন না কোনভাবে সাহায্য করবে পরবর্তী জীবনে। অফিসে কেরানী বা কর্মচারী বা কর্মকর্তা হয়ে টিক দেয়ার জায়গা নেই। ফাইলে নোট, সার সংক্ষেপ বা সামারী লিখতে তো ভাষা বা প্রকাশ ক্ষমতা লাগবে। তা'হলে এ টিক টাকের প্রয়োজন কোথায়? শিক্ষায় কোন গ্রেস মার্ক দেয়ার মহানুভবতা থাকা উচিত বলে আমরা মনে করি না। যে পাস করে না তাকে পাস করানোর প্রয়োজন নেই। একটি ছাত্র-ছাত্রী দুই পত্র বিশিষ্ট বিষয়ে ৬৪ পেলে তাকে ২ নম্বর দিয়ে পাস করান হয়। ৩৩০ নম্বরে তৃতীয় বিভাগ হয় ৩২৯ পেলে ১ নম্বর, ৪৪৯ পেলে ১ নম্বর, ৫৯৯ পেলে তাকেও ১ নম্বর দিয়ে বিভাগ দেয়া হয়। বিগত দুই বছর গ্রেস মার্ক ছিল না।

না। আমরা খুশী ছিলাম। এবার আবার ১০ নম্বর খয়রাতি নম্বর দিয়ে পাস করান হয়েছে। কেন? শতকরা হার বাড়াতে হবে। নইলে বেসরকারী কলেজগুলো বন্ধ হয়ে যাবে। যাক, এত ব্যাঙের ছাতার মতো স্কুল-কলেজের প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই গ্রামের লোকের দোরগোড়ায় পরীক্ষা কেন্দ্র নিয়ে যাওয়া। জেলা শহরে পরীক্ষা কেন্দ্র করা হোক। গ্রামে পরীক্ষা কেন্দ্র করে পরীক্ষায় দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়া হয়েছে বলে অনেকেই ভাবেন।

এখনও সময় আছে- এ দেশের শিক্ষা নীতি পরিবর্তন যখন তখন বন্ধ করা হোক। লেখাপড়া ও পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর মেধা যাচাইয়ের জন্য সর্বপ্রকার দয়া দাক্ষিণ্য পরিহার করে তারা যাতে প্রকৃত শিক্ষিত হয়ে ওঠে লেখাপড়া করে, সেই ব্যবস্থা গৃহীত হোক। অন্যথায় শিক্ষার এই যে বৈষম্য সৃষ্টি হচ্ছে, এই বৈষম্য দেশকে ধ্বংসের পথের দিকে নিয়ে যেতে বাধ্য। আমরা আশা করব শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি স্থায়ী নীতি প্রতিষ্ঠিত হোক। কোন উন্নত দেশে শিক্ষা ও পরীক্ষা পদ্ধতি এত দ্রুত পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। আমাদের দেশেও একটি গ্রহণযোগ্য প্রয়োজনীয় পদ্ধতি আবশ্যক।